সর্বস্য লোকে নিয়তো বিনাশঃ (বু. ৩|৫৯)
অকালো নাস্তি ধর্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি (বু. ৫|২১)
রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ম্ (বু. ৯|৪১)
লোকস্য কামৈর্ন বিতৃপ্তিরস্তি পতঙ্গিরম্ভোভিরিবার্ণবস্য (বু. ১১|১২)
গতং গতং নৈব তু সংনিবর্ততে জলং নদীনাং নৃণাং চ যৌবনম্ (সৌ. ৯|২৮)
প্রমদাঃ সমদা মদপ্রদাঃ, প্রমদা বীতমদা ভয়প্রদাঃ (সৌ. ৮|৩২)

কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি কালিদাস। কালিদাস বলতে আজ আমরা শুধু এক ব্যক্তিকেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সুবর্ণযুগকে বুঝি— যে যুগের সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহাকবি কালিদাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকগণের ন্যায় এই কবির দেশ-কাল ও জীবনচর্যা সম্পর্কেও যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের কোন্ নগরীতে কোন্ কালে কালিদাসের জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রাচীন কাল থেকেই এই কবির সম্পর্কে নানান কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতি গড়ে উঠেছে[১৬]।

কালিদাসের কাল ঃ কবির জীবৎকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা যেসব সিদ্ধান্ত করেছেন, তার মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন যেমন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তেমনি জীবৎকালও ঐতিহাসিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্যভাবে নিরূপিত হয় নি। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ্রী. পূ. ২য়-খ্রী. ৬ষ্ঠ শতকের কোনও সময়ে কালিদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে কাল নির্ণয়ের পূর্বে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আলঙ্কারিক দণ্ডী (আনুমানিক ৭ম শঃ) কাব্যাদর্শে শকুন্তলার শ্লোকাংশ (লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি ১|১৫) উদ্ধৃত করেছেন; বাণভট্ট (৭ম শঃ) হর্ষচরিতে (১|১৬) কবির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন; রবিকীর্তি রচিত ২য় পুলকেশীর অইহোলি শিলালেখে (৬৩৪ খ্রী.) কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত; বৎসভট্টির মন্দসোর লেখের (৪৭২ খ্রী.) কতিপয় শ্লোকের সঙ্গে মেঘদূত ও ঋতুসংহারের শ্লোকের মিল আছে; দার্শনিক কুমারিল ভট্ট (৮ম শঃ) তন্ত্রবার্তিকে শকুন্তলার শ্লোকাংশ (সতাং হি সন্দেহপদেষু...) উদ্ধৃত করেছেন; গউড়বহো নামক প্রাকৃত কাব্যে কবি 'রঘুকার' অভিধায় উল্লিখিত; বামন কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে কুমারসম্ভবের (১|৩৫) একটি শ্লোকের অন্তর্গত পদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন; জৈন কবি জিনসেন (৮১৩ খ্রী.) সমস্যাপূরণের আকারে মেঘদূতের প্রতি শ্লোকের চরণ সহ পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য রচনা করেছেন। এলাহাবাদে আবিষ্কৃত ভীটা পদকে অঙ্কিত দৃশ্যের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথমাঙ্কে বর্ণিত মৃগয়া-দৃশ্যের সাদৃশ্য আছে; এতদ্ব্যতীত ৮ম-৯ম শতকের কবিপণ্ডিতদের রচনাতেও (ক্ষীরস্বামীর অমরকোষ টীকায়, জৈন শাকটায়নের অমোঘবৃত্তি প্রভৃতিতে) কালিদাসের কবিতার অংশ অথবা তাঁর নাম পাই। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কালিদাস ৭ম শতকের পূর্ববর্তী।

Scanned by CamScanner

কোনও কোনও পণ্ডিতের অনুমান কবি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের (১৮৪-১৪৯ খ্রী. পূ.) পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন। এই অনুমানের পক্ষে তাঁরা বলেন মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকটি রাজা অগ্নিমিত্রের সম্মানার্থে রচিত[৪৭]।

বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। কারও কারও অনুমান এই রাজা শকারি বিক্রমাদিত্যই খ্রী. পূ. ৫৭ অব্দে 'বিক্রম সংবৎ' প্রচলন করেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না[৪৮]। কালিদাসের রচনারূপে উল্লিখিত জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে নবরত্নের নজন পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেলেও জানা গেছে উক্ত গ্রন্থটি কালিদাসের রচনা নয়, ১৬শ শতকের কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা।

অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৩য়-৫ম শঃ) কালিদাস জীবিত ছিলেন। তাঁদের অনুমান ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৬-৪১৪ খ্রী.) সভাকবিরূপে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়, মালবিকাগ্নিমিত্রে অশ্বমেধের উল্লেখ ও হূণদের পরাজয় বর্ণনা প্রভৃতির দ্বারা ২য় চন্দ্রগুপ্তেরই কীর্তিকলাপ বর্ণিত; কুমারসম্ভব কাব্যটিও সম্ভবতঃ ১ম কুমারগুপ্তের (৪১৫-৫৫ খ্রী.) জন্ম স্মরণ করে রচিত[৪৯]। বলা বাহুল্য এরূপ অনুমানের পশ্চাতে ইতিহাসের প্রমাণ সংগ্রহ করা দুষ্কর।

১৯৪১ সালে সমুদ্রগুপ্তের রচনারূপে অভিহিত কৃষ্ণচরিত নামক গ্রন্থের খণ্ডিত অংশ প্রকাশিত হওয়ার পর মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে নূতনভাবে বিতর্কের শুরু হয়[৫০]। উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নাট্যকার কালিদাস ও মহাকাব্যকার কালিদাস পৃথক পৃথক ব্যক্তি; অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রচয়িতা কালিদাস ছিলেন রাজা শূদ্রকের সভাকবি এবং 'রঘুকার' (ইনি রঘুবংশ ব্যতীত কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি অন্যান্য ৪টি কাব্যেরও রচয়িতা) কালিদাস ছিলেন গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি (৪১৫-৫৫ খ্রী.)। এই দ্বিতীয় কালিদাসের অনুরোধে সমুদ্রগুপ্ত কৃষ্ণচরিত রচনা করেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের অধিকাংশের মতেই নাট্যকার ও মহাকাব্যকার কালিদাস একই ব্যক্তি এবং তাঁর তিনটি নাটক, দুটি মহাকাব্য ও মেঘদূতের রচনাশৈলী আলোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে এগুলি একই ব্যক্তির রচনা। তাই অনেকেই সন্দেহ করেছেন যে কৃষ্ণচরিত প্রাচীন রচনা নয়, সম্ভবতঃ একালের কোনও করি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য গ্রন্থটির রচনা করেন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রাচীন রচনারূপে চালানোর অপচেষ্টা করেন।

কারও কারও মতে[৫১] অশ্বঘোষ কালিদাসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং যেহেতু অশ্বঘোষের জীবৎকাল আনুমানিক ১ম শঃ, সেহেতু কালিদাসকে খ্রী. পূ. যুগের কবিরূপে নির্দেশ করা যায়।

ভোজের (শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী) কুন্তলেশ্বর বা কুন্তেশ্বরদৌত্যে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী কালিদাস বিক্রমাদিত্যের দূতরূপে বাকাটক প্রবরসেনের সভায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু উক্ত বিক্রমাদিত্য কোন্ রাজা এবং কালিদাসই বা কোন্ কবি তৎসম্পর্কে ভোজ নীরব[৫২]।

Scanned by CamScanner

এযাবৎ উপলব্ধ বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়াও কালিদাসের কাল নির্ণয়ে তাঁর রচনায় প্রদত্ত অন্যান্য তথ্যাদিও বিবেচ্য—রাজার দেহরক্ষিণীরূপে যবনী নারীদের উল্লেখ, জ্যামিত্র (Gk. diametron) শব্দের প্রয়োগ, হূণদের পরাজয়ের উল্লেখ, আদর্শ রাজার বর্ণনায় মনুসংহিতার প্রভাব, রত্ন চুরির জন্য প্রাণদণ্ডের উল্লেখ, শিবের প্রতি অতিশয় ভক্তি, তাপস অর্থে বৈখানস শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি। সুতরাং ইতিহাসের নতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে খ্রী. পূ. ২য় শঃ—খ্রী. ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে কবি জীবিত ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায়।

দুটি মহাকাব্য, তিনটি নাটক ও একটি কাব্য কালিদাসের রচনারূপে বহুজনস্বীকৃত এবং বহুল পরিচিত। পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গাররসাষ্টক, নলোদয় প্রভৃতি অন্যান্য বহু গ্রন্থও কালিদাসের রচনারূপে প্রচলিত[৫৩]; তবে পণ্ডিতদের মতে এগুলি মহাকবি কালিদাসের রচনা নয়। এগুলি সম্ভবতঃ কালিদাস নামধারী পরবর্তী কবিদের রচনা, অথবা অজ্ঞাতনামা কবিদের এই গ্রন্থগুলি কালিদাসের নামে প্রচলিত। ১০ম শতকেই একাধিক কালিদাসের নাম পাওয়া যায়[৫৪]।

বিদ্বজ্জনের মতে কালিদাসের রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ তথ্য-প্রমাণাদি বিচারপূর্বক তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে একটি আনুমানিক পৌর্বাপর্য নির্দেশ করা যায়। ক্রমটি এরূপ—ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব (প্রারম্ভ অংশ) মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, কুমারসম্ভব (শেষাংশ), বিক্রমোর্বশীয়, রঘুবংশ ও শকুন্তলা।

ঋতুসংহার[৫৫] ঃ ছয় সর্গে ১৫২ শ্লোকে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত অবধি ছয় ঋতুর বর্ণনা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কালের বিবর্তনে প্রকৃতিরাজ্যের পটপরিবর্তনে নিসর্গশোভার চিত্র, প্রাণিজগতের সুখ-দুঃখ, লীলাবিলাস, বিশেষতঃ প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের দেহেমনে শৃঙ্গারের বাহ্য ভোগ-উপকরণ ও মানসিক বৈচিত্র্য বর্ণিত। কালিদাসের অন্যান্য রচনার তুলনায় এই কাব্যের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত সরল ও অনাড়ম্বর। চিত্রধর্মিতা ও গীতিধর্মিতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য[৫৬]। ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে[৫৭]। অবশ্য অনেকেই একে কালিদাসের রচনারূপে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কারও কারও অনুমান এই কাব্য কবির অপরিণত বয়সের রচনা, তাই কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট[৫৮]। সরল রচনাশৈলীর জন্যই সম্ভবতঃ মল্লিনাথ এই কাব্যের টীকা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'এর (ঋতুসংহার কাব্যের) মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসঙ্গীত আছে, তাতে স্বরগ্রাম তালের নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয় নি[৫৯]।

বর্ষার জলভারাক্রান্ত নব মেঘের উদয়ে মিলনপিয়াসী মানব-মানবীর অন্তরের আকুতি, শরতের নির্মল পরিবেশে ভোগের স্নিগ্ধ আয়োজন, হেমন্তে পাকা ফসলের সম্ভারে পরিপূর্ণা ধরণীতে উচ্ছল জীবনের বৈচিত্র্য, কুহেলিমাখা শীতের শীতল দিনে মিলনসুখের গাঢ়তা, বসন্তের রমণীয় কালে বিলাসের বিবিধ উপকরণ ছত্রে ছত্রে বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালী' কাব্যের 'ঋতুসংহার' কবিতায় আলোচ্য রচনার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন[৬০]। এখানে ঋতুগুলি পার্থিব সুখ-সম্ভোগের বাতাবরণে চিত্রিত—

Scanned by CamScanner

সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ॥ ১।৩
শিরোরুহৈঃ শ্রোণীতটাবলম্বিভিঃ কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ স্ত্রিয়ো রতিং সংজনয়ন্তি কামিনাম্॥ ২।১৮
হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ নার্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি॥ ৩।২০
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলং।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্॥ ৫।৩

বৈদিক সাহিত্যে ঋতুসংহার নেই; বৈদিক কবিরা ঋতুর এমন চিত্র পরিকল্পনা করেন নি। রামায়ণে ঋতুবর্ণনা আছে; সীতার অপহরণের পর বিরহী রামের দৃষ্টিতে বর্ষা ও শরতের বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি। কালিদাস নিঃসন্দেহে আদি কবির দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু উভয় বর্ণনায় পার্থক্য বিস্তর। পরিবর্তনশীলা প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ বাল্মীকি প্রকৃতি-প্রেমিকের চোখে তার নানা রঙের রূপ এঁকেছেন; কিন্তু কালিদাস মুখ্যতঃ কামিজনের চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃতির বিলাস-বৈচিত্র্য, আসক্তি-উদ্দীপনা ও যৌনবৃত্তির বহুমুখী প্রকাশ উজ্জ্বল দীপ্র ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই কাব্যের সমালোচনায় মানবজীবনে সৌন্দর্যচেতনা ও ভোগসাধনার সমন্বয়ের কথা বললেও সহজ ইন্দ্রিয়রতির প্রবণতাটি লক্ষ্য করেছেন[৬১]।

মেঘদূত[৬২] ঃ কালিদাসরচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা মেঘদূত মন্দাক্রান্তার ধীরললিত গম্ভীর বিন্যাসে প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় গীতিকাব্যের সাম্রাজ্যে অতুলনীয় গৌরববাহী। কর্তব্যের অনবধানতায় প্রভুশাপে রামগিরির বিজন আশ্রমে নির্বাসিত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে নববর্ষার নতুন মেঘকে দেখে অলকার রম্য নিকেতনে বিরহিণী প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে শুভ বার্তা পাঠাতে মনস্থির করেছেন। বিরহদুঃখের আতিশয্যে প্রেমিক যক্ষের নিকট জড় ও চেতনের ভেদাভেদ লুপ্ত; বর্ষার মেঘ দেখে প্রেমসুখে মগ্ন মানুষের হৃদয়েও অজ্ঞাত বিরহের আশঙ্কা জেগে ওঠে। যক্ষের অনুরোধমত মেঘ তার যাত্রাপথে নগ-নদী-নগরীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে 'কামনার মোক্ষ ধাম অলকায়' পৌঁছে বিরহবিধুরা যক্ষপ্রিয়াকে দেখতে পাবে। মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনায় ভৌগোলিক ভারতের এক রসময় চিত্র উপস্থাপিত—মানস সরোবর, অমরকূট পর্বত, দশার্ণ জনপদ, বিদিশা নগরী, আম্রকূট শৈল, বিশীর্ণা রেবানদী, চলোর্মি বেত্রবতী, চর্মণ্বতী-শিপ্রা-দৃশদ্বতী-নির্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু নদী, ব্রহ্মাবর্ত-কুরুক্ষেত্র-দশপুর প্রভৃতি জনপদ, সরস্বতী-মানস সরোবর প্রভৃতি আরও কত খ্যাত-অখ্যাত স্থান। অতঃপর যক্ষনিবাস সুরম্য অলকাপুরী—তার গগনস্পর্শী অট্টালিকায় লাবণ্যবতী ললনারা বিরাজিতা, সেখানে প্রণয়কলহ ভিন্ন কলহ নেই, যৌবন ভিন্ন বয়স নেই, আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রু ঝরে না। এমন মনোরম পরিবেশে যক্ষের বাসগৃহ—সেখানে ইন্দ্রধনুতুল্য সুচারু তোরণ, গৃহদীর্ঘিকায় মরকত মণির সোপান। অলকাপুরীর সুন্দরীরা আদি-সৃষ্টি তিলোত্তমার ন্যায় অপরূপা

Scanned by CamScanner

সুন্দরী—তারা তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, তাদের হাতে লালীকমল, অলকে বালকুন্দ, মুখে লোধ্রপরাগের পাণ্ডুশ্রী, বেণীবন্ধে নব কুরবক। তারপর দেখা যাবে বিরহবিধুরা যক্ষপ্রিয়া—যেন শিশিরমথিতা মৃণালিনী, প্রাচীমূলে শীর্ণ চন্দ্রকলা; মলিনবসনা একবেণীধরা সেই বিরহিণীর কোলে রাখা বীণার তারগুলি চোখের জলে ভেজা, বিনিদ্র রজনী যাপনের দুঃখে চোখ ফোলা, ঠোঁটদুটি মলিন। অবশেষে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করছে পত্নীর কাছে কুশল সংবাদ নিবেদন করতে।

আলোচ্য কাব্যটি সাধারণভাবে 'মেঘদূত' বা 'মেঘসন্দেশ' নামে পরিচিত এবং 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তর মেঘ' এই দুখণ্ডে বিভক্ত; কিন্তু এই বিভাগ কবিকৃত নয়। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বর্ষার দূতরূপে মেঘের উল্লেখ আছে[৬৩]। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে (২৭৪ খ্রী. পূ.) জনৈক কবির কবিতায় মেঘ প্রেমের বার্তাবাহী দূতরূপে প্রেরিত[৬৪]। টীকাকার মল্লিনাথের মতে মেঘদূতের উৎস হল রামায়ণে সীতার কাছে রাম কর্তৃক হনুমানকে দূতরূপে প্রেরণের ঘটনা[৬৫]। অবশ্য মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনীতে দময়ন্তী হাসকে দূত করে অদেখা-অজানা প্রেমিকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন মেঘদূতের ভাবধারা সম্পূর্ণ মৌলিক; কিন্তু সকলে এমত গ্রহণে সম্মত নন[৬৬]। প্রাচীনদের মতে মেঘদূত কেলিকাব্য, ক্রীড়াকাব্য বা খণ্ডকাব্য[৬৭] বা মহাকাব্য; আধুনিক মতে 'বর্ষাকাব্য', 'বিরহকাব্য' অথবা 'গীতিকাব্য'। বস্তুতপক্ষে এ-কালের ইংরেজী সাহিত্যে যাকে 'লিরিক' বলে, মেঘদূত তা নয়; কিন্তু লিরিকের মৌল উপাদান আত্মমগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস এতে বর্তমান। বিরহিহৃদয়ের উৎকণ্ঠা, প্রণয়ের আসঙ্গলিপ্সা, অপূর্ণ বাসনা-কামনার আর্তি ও গীতিপ্রবণতা এই কাব্যটিকে অনন্যসুলভ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। অন্যদিকে মেঘের যাত্রাপথের বিবরণ, অলকার বর্ণনা, বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার চিত্র প্রভৃতি মহাকাব্যোচিত নিষ্ঠায় ও আড়ম্বরে পরিবেশিত।

শুদ্ধ বিরহকে অবলম্বন করে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ কাব্য মেঘদূত। আষাঢ়ের ধারাসম্পাতে নিখিল বিরহিহৃদয়ের মুখর গীতিকা যেন বহুধারায় বর্ষিত। রসবাদী সমালোচকদের মতে পার্থিব বিরহ-বেদনার বিশ্বব্যাপী অলৌকিক অনুভূতির আনন্দই মেঘদূতের বার্তা। প্রেমের অপূর্ণতাই বিরহ, প্রণয়ের অতৃপ্তিই বিরহের সাহিত্যকে মানুষের অন্তরে মহনীয় করে তোলে। কোনও আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে মেঘদূত 'অবদমিত প্রেমের কাব্য'। দেহরতির যে আকৃতি পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়, বিরহ-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তাই শুচিস্নিগ্ধ ভাবের আদর্শে রমণীয়তা লাভ করে। ভারতীয় আদর্শে বিরহবিচ্ছেদহীন প্রেম অসম্পূর্ণ। সংস্কৃতসাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ, বৈষ্ণবকাব্যে তার সঙ্গে হৃদয়ের বিরহ—আধুনিক 'রোমান্টিক' কাব্যে তাই অতীন্দ্রিয় নিখিল-বিরহে রূপান্তরিত। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় 'রোমান্টিক' কাব্যের একটি প্রধান সুর বিরহের আর্তিতে সোচ্চার। রবীন্দ্রনাথ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের মধ্যে শাশ্বত সৌন্দর্য ও আনন্দের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন[৬৮]।

কালিদাসের মেঘদূত অতি প্রাচীনকালেই জনপ্রিয়তার শিখরে স্থান পেয়েছিল। একদিকে পঞ্চাশটির অধিক টীকা, বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, অন্যদিকে এর অনুকরণে পঞ্চাশাধিক

Scanned by CamScanner

দূতকাব্যের রচনা এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ। তীব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মাচার্যেরা সংস্কারমুক্ত চিত্তে এই প্রেমকাব্যের অনুবাদ করেছিলেন এবং জৈন সন্তগণও এর অনুকরণে মহাপুরুষদের জীবনী ও ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন[৬৯]। আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতরসিকেরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন[৭০]।

টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কাশ্মীরী বল্লভদের (১০ম শঃ), মল্লিনাথ সূরি (১৪শ শঃ), দক্ষিণাবর্তনাথ, স্থিরদেব প্রভৃতি[৭১]। জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন সময়ে মেঘদূতের মূল রচনার মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও স্থান পায়[৭২]।

কালিদাসের নাটকত্রয়ীর মূল কাহিনী বহুবল্লভ রাজার প্রেম ও তদ্‌ঘটিত দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ও নৈতিক বাধাবিঘ্নের অবসানে বিবাহের মধ্য দিয়ে মিলনান্ত পরিণতি।

মালবিকাগ্নিমিত্র[৭৩] ঃ বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয় অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। নায়ক অগ্নিমিত্র বর্ষীয়ান রাজা, তাঁর দুই পত্নী ধারিণী ও ইরাবতী। নায়িকা মালবিকা শবরদের দ্বারা অপহৃতা হয়ে দৈবক্রমে অজ্ঞাতপরিচয় অবস্থায় অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হন। পট্টরাজ্ঞী ধারিণীর পটে তার পার্শ্বচারিণী মালবিকার চিত্র দেখে রাজা এই অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণীর প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু রাণী সর্বদা এই সুন্দরী তরুণীকে রাজার চোখের আড়ালে রাখতে সচেষ্ট। বিদূষকের কৌশলে মালবিকা অন্তঃপুরে নৃত্যপরীক্ষায় নাচ দেখালেন। রাজা মালবিকাকে সাক্ষাৎ দেখলেন; উভয়ের পূর্বরাগ ঘনীভূত হল। অতঃপর প্রমোদকাননে নায়ক-নায়িকার নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটল; অগ্নিমিত্র যখন মালবিকাকে আলিঙ্গনে উদ্যত, সেই সময় কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। অগ্নিমিত্র স্ত্রীর ভর্ৎসনা লাভ করলেন। পারিবারিক অনর্থ নিবারণের জন্য মালবিকাকে গৃহবন্দিনী করা হল। পুনরায় বিদূষকের চুতর্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ ঘটল; কিন্তু এবারেও রাণী ইরাবতীর আকস্মিক উপস্থিতির ফলে প্রণয়ভঙ্গ হল। কিছুদিন পর অজ্ঞাতকুলশীলা নায়িকার রাজকুমারী মালবিকারূপে যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল; জানা গেল যে মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের হাতে সম্প্রদান করার জন্য তাঁর আত্মীয়া কৌশিকী এক বণিককে সঙ্গে করে যখন বিদিশায় আসছিলেন, তখন শবরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি ভাগ্যবলে ধারিণীর অসবর্ণ ভাই সীমান্তদুর্গের রক্ষক বীরসেনের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর হাতেই মালবিকাকে ধারিণীর কাছে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্পণ করেন। অতঃপর পত্র মারফৎ সংবাদ পাওয়া গেল অগ্নিমিত্রের তরুণ পুত্র বসুমিত্র সিন্ধুতীরবর্তী যবনদের পরাস্ত করেছেন। পুত্রের যুদ্ধবিজয়ের সংবাদে আনন্দিতা ধারিণী ইরাবতীর সম্মতি নিয়ে মালবিকার সঙ্গে স্বামীর বিবাহের অনুমতি দিয়ে নায়ক-নায়িকার শুভ মিলন ঘটালেন।

বিক্রমোর্বশীয়[৭৪] ঃ পুরূরবা-উর্বশীর প্রেম এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের কাহিনী। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাহিনী অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় ছিল। ঋগ্‌বেদের সংবাদ-সূক্ত থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও পুরাণে আলোচ্য আখ্যান বর্ণিত এবং নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই জনপ্রিয় কাহিনী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য পর্যন্ত অখণ্ড ধারায়

Scanned by CamScanner

প্রবাহিত। নাট্যকার কালিদাস প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা আলোচ্য প্রণয়কাহিনীকে এই নাটকে নবায়িত করে তুলেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু এরূপ—কৈলাস পর্বত থেকে সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কালে অপ্সরা উর্বশী যখন অসুরদের হাতে লাঞ্ছিতা হন, তখন মর্তের রাজা পুরূরবা ঐ স্থান দিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অপ্সরার আর্তনাদ শুনে রাজা তাকে দানবের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। তারপর উর্বশী সখীদের সঙ্গে স্বর্গে ফিরে গেলেন; কিন্তু তার মনে মর্ত্য রাজার প্রেমের স্মৃতি অম্লান রইল। প্রেমমুগ্ধ রাজা যখন প্রমোদ-উদ্যানে নর্মসহচর বিদূষকের কাছে গোপন কাহিনী প্রকাশ করে মনের কথা খুলে বলছেন, তখন উর্বশী সেখানে অলক্ষিতে উপস্থিত হয়ে সেই কথাবার্তা শুনে গভীর প্রেমে আবদ্ধা হলেন। কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ না ঘটতেই উর্বশীকে সেই স্থান ত্যাগ করে দেবদূতের আহ্বান শুনে সত্বর স্বর্গের দেবসভায় ফিরে যেতে হল, কারণ সেখানে ভরত সম্পাদিত নাট্যাভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভূর্জপত্রে লেখা অপ্সরার প্রেমপত্র প্রমোদবনে সবার অলক্ষ্যে মাটিতে পড়ে রইল। এমন সময় রাজমহিষী পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে হাজির হলেন। দুর্ভাগ্যবশে উর্বশী রচিত প্রেমপত্র রাণীর পরিচারিকা নিপুণিকার দৃষ্টিগোচর হল। নিপুণিকা সেটি কুড়িয়ে মহারাণীর হাতে দিলেন। গোপন প্রেমের খবর ফাঁস হয়ে গেল; পুরূরবা হাতেনাতে ধরা পড়ে স্ত্রীর পায়ে ধরে মার্জনা চাইলেন। রাণী স্বামীকে ক্ষমা করলেন। অতঃপর চতুর রাজা মহারাণীর ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উদাসীন রইলেন। অন্যদিকে স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকে উর্বশী 'পুরুষোত্তম' শব্দের পরিবর্তে ভুলবশতঃ 'পুরূরবা' শব্দ উচ্চারণ করে আচার্যের দ্বারা অভিশপ্তা হলেন যে স্বর্গ ত্যাগ করে মর্তে জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু ইন্দ্রের অনুগ্রহে শাপ বরে পরিণত হল—সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত উর্বশী পুরূরবার সান্নিধ্য লাভ করবেন। মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে অভিসারিকার বেশধারিণী উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার মিলন হল। রাজমহিষীর অনুগ্রহে পুরূরবা উর্বশীকে গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একদিন উর্বশী প্রণয়কোপে নিজের অজ্ঞাতে স্ত্রীলোকের নিষিদ্ধ কুঞ্জে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলেন। প্রেমোন্মাদ রাজা বৃক্ষলতা-পশু-পাখীকে প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তারপর দৈববশে 'সংগমন' মণির স্পর্শে উর্বশী পুনরায় স্বদেহ ফিরে পেলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলন হল। অন্যদিকে তাদের পুত্র আয়ু পিতার অজ্ঞাতে বড় হচ্ছিল। একদিন এক বাণবিদ্ধ পাখী হঠাৎ পুরূরবা-উর্বশীর সামনে এসে পড়ল; উভয়ে লক্ষ্য করলেন সেই বাণে তাদের পুত্র আয়ুর নাম লেখা। কিছুক্ষণ পর জনৈকা স্ত্রীলোক আয়ুকে সঙ্গে করে তার মায়ে হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য উর্বশীর কাছে উপস্থিত হলেন। এবার পুত্রমুখ দর্শনের ফলে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরতে হবে। এই সময় দেবদূত নারদ হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা জানালেন এবং দেব-দানব সংগ্রামে দেবতাদের সাহায্য করতে পুরূরবাকে ইন্দ্রের আহ্বান জানালেন। অবশেষে পুরূরবা বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আজীবন স্বর্গে অপ্সরা উর্বশীর সান্নিধ্য লাভের বর পেলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল[৫] : মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা সপ্তাঙ্ক নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদসের এক অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি। মূল বস্তু কণ্বের আশ্রমপালিতা

Scanned by CamScanner

কন্যা শকুন্তলা ও পুরুবংশের রাজা দুষ্মন্তের প্রেম ও বিবাহ। একদা মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত এক হরিণের পিছনে রথ ছোটাতে ছোটাতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ঢুকে পড়েন। সেখানে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সখীর সঙ্গে শকুন্তলা আশ্রমের গাছে জল দিচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে দুষ্মন্তের দেখা হল। প্রথম দর্শনেই রাজা শকুন্তলার রূপের মোহে মজলেন; শকুন্তলাও রাজাকে মন দিয়ে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাজা শকুন্তলার নামধাম ও বংশপরিচয় জেনে খুবই আশ্বস্ত হলেন। ইতাবসরে এক বুনো হাতী আশ্রমে ঢুকে পড়লে আশ্রমবাসী সকলে সন্ত্রস্ত হলেন; শকুন্তলা আর তার সখীরা অভ্যন্তরে চলে গেলেন, রাজাও নিজের শিবিরে ফিরলেন। রাক্ষসেরা কণ্বের আশ্রমে ভয়ানক উপদ্রব করছে, তাই কণ্বের দুই শিষ্য এসে পুনরায় রাজাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইলেন। অন্যদিকে রাজধানী থেকে দূত এসে জানাল যে রাজমাতা ছেলের মঙ্গলের জন্য ব্রত করেছেন, তাই রাজাকে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। দুষ্মন্ত উভয় সঙ্কটে পড়লেন। কিন্তু তিনি সুকৌশলে নিজের পরিবর্তে বিদূষককে রাজমাতার কাছে পাঠিয়ে স্বয়ং আশ্রমে চললেন। পুনরায় আশ্রমে নায়ক-নায়িকার দেখা হল। তখন রাজার বিরহে শকুন্তলার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সঙ্গীন। কাজের ছুতোয় সখীরা শকুন্তলাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। নায়ক-নায়িকার নিভৃত মিলন ঘটল। গান্ধর্ববতে উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হল। রাজা শকুন্তলার হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে যথাসময়ে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন। শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্না। আশ্রমের প্রভাবশালী অতিথি দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যের অবহেলার জন্য তিনি ঋষির দ্বারা অভিশপ্তা হলেন—শকুন্তলার যার চিন্তায় আত্মবিস্মৃতা, তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হবেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা দুর্বাসার পায়ে পড়লেন; অভিশাপ কিছুটা কমল—কোনও অভিজ্ঞান দেখালে শাপের প্রভাব দূর হবে। অভিশাপের কথা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারল না। অতঃপর কণ্ব আশ্রমে ফিরেছেন। তিনি তপঃশক্তিতে শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ ও অন্যান্য ঘটনা জানলেন। ঋষির আদেশে আসন্নপ্রসবা শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে দুষ্মন্তের প্রাসাদে পাঠান হল। কিন্তু দুষ্মন্ত দুর্বাসার অভিশাপে সমগ্র ঘটনা বিস্মৃত হয়েছে, তাই তিনি শকুন্তলাকে পরস্ত্রী বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। শকুন্তলা অনেক চেষ্টা করেও নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না, তাই তিনি কঠোর ভাষায় স্বামীকে ভর্ৎসনা করলেন। এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি স্বামী-প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে নিয়ে অজানা স্থানে উধাও হল। শকুন্তলার হাতে রাজার নামলেখা যে আংটি ছিল, সেটি শচীতীর্থের জলে পড়ে যায়। কিছুদিন পর এক জেলে শহরের বাজারে সেই আংটি বিক্রি করতে এসে নগর-কোতোয়ালের হাতে ধরা পড়ে। জেলের মুখে জানা গেল রুই মাছের পেটের ভিতর ঐ আংটি সে উদ্ধার করেছিল। এই আংটি শকুন্তলাকে দেওয়া রাজার নামলেখা সেই অভিজ্ঞান। আংটি দেখার পর দুর্বাসার অভিশাপ কেটে গেল। দুষ্মন্ত পূর্বাপর কাহিনী স্মরণ করে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তীব্র দুঃখে কাল কাটাতে লাগলেন। কিছুকাল পরে স্বর্গে দেব-দানবের যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে সাহায্য করে রাজ্যে ফেরার সময় মারীচ ঋষির আশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পুনর্মিলন হল।

Scanned by CamScanner

কালিদাসের কাব্য অপেক্ষা নাটকগুলির টীকা সংখ্যায় অল্প। নাটকত্রয়ীর মধ্যে শকুন্তলার টীকাই বেশি[১৬]।

নাট্য কাহিনীর উৎস ঃ মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের মূল কাহিনীটি সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শুঙ্গবংশের রাজারা শতাধিক বৎসর (মোট ১১২ বৎসর) রাজত্ব করেছিলেন। নায়ক অগ্নিমিত্র এই বংশের অন্যতম রাজা। নাট্যকার অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্যমিত্র, তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং রাজপুত্র বসুমিত্র কর্তৃক সিন্ধুতীরবর্তী যবনদের পরাজয়ের উল্লেখ করেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন[১৭]।

পুরূরবা-উর্বশীর প্রণয় কাহিনী বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর ও পুরাণে (বিষ্ণু, মৎস্য ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে) অতীব জনপ্রিয় উপাখ্যান। ঋগ্‌বেদে বর্ণিত এই প্রণয়কাহিনী মূলতঃ বিয়োগান্ত উপাখ্যান ছিল। কোনও কোনও ভাষাতাত্ত্বিক একে ভারত-য়ুরোপীয় (Indo-European) সাহিত্যের প্রাচীনতম 'রোমান্টিক প্রেমকাহিনী' বলেছেন। ব্রাহ্মণে এই মূল বিয়োগান্ত কাহিনী মিলনান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে—অর্থাৎ মৃত্যু পর গন্ধর্বলোকে নায়ক-নায়িকার মিলন পরিকল্পিত। বৈদিক কাহিনী অলৌকিক উপাদান ও অতিকথার (myth) বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বৈদিক তথা পৌরাণিক উপাখ্যানটি কালিদাসের নাট্যকাহিনীর উৎস হলেও অভিজ্ঞানশকুন্তলের ন্যায় আলোচ্য নাটকও কাহিনীবৈচিত্র্যে ও নাট্যগুণে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা মৎস্য পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে নাট্যবস্তুর সাদৃশ্য বেশি। এই পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানেও ভরতের দ্বারা অভিশপ্তা উর্বশী লতায় পরিণতা। তবে উর্বশীর মর্ত্যবাস, অন্তঃপুরের দ্বন্দ্ব, অভিশপ্তা নায়িকার অনুসন্ধানী রাজার প্রলাপ প্রভৃতির উদ্ভাবনায় নাট্যকার বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন।

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়বৃত্ত মহাভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ আখ্যান। কালিদাস মহাভারতপ্রসিদ্ধ কাহিনীকে অবলম্বন করে বিবিধ মৌলিক উপাদান ও নূতন আঙ্গিকের সংযোগে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক সৃষ্টি করেছেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনীর সঙ্গে নাট্যকাহিনীর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিতদের অনুমান পুরাণকার মহাভারতীয় ও কালিদাসীয় কাহিনীর সমন্বয়ে আপন কাহিনী গঠন করেছেন। কট্‌ঠহরি জাতকে বর্ণিত রাজা ব্রহ্মদত্তের কাহিনীর সঙ্গে দুষ্যন্তের কাহিনীর অত্যন্ত মিল আছে। জাতকের আখ্যান মহাভারতপ্রসিদ্ধ দুষ্যন্ত-আখ্যানেরই বিকৃত রূপ এমন অনুমান করা যায়। অবশ্য কালিদাসের নাট্যকাহিনীতেও জাতকের কিঞ্চিৎ প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের কাহিনী রাজান্তঃপুরের সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত; কাহিনীগ্রন্থনাতে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। নায়ক চরিত্রটিও আদর্শ বিচারে কিঞ্চিৎ দুর্বল; প্রৌঢ় রাজার প্রণয় ও তার বিরুদ্ধে দুই রাজমহিষীর ঈর্ষ্যাকুটিল সংঘাত, আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে গোপন প্রেমের সফল পরিণতি এই নাটকের একমাত্র বিষয়।

Scanned by CamScanner

আলোচ্য ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি দেখে খুশী হওয়া ছাড়া অতিরিক্ত কোনও আদর্শগত প্রত্যাশা পূরণ হয় না। তিনটি নাটকেই কাহিনীর আঙ্গিকগত মিল লক্ষণীয়—অগ্নিমিত্র, পুরূরবা ও দুষ্যন্ত এই তিন নায়ক বহুবল্লভ রাজা, তাঁরা প্রত্যেকেই নবীনা নায়িকার প্রতি গভীর প্রেমে আসক্ত; প্রতিনায়িকারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রণয়কাহিনীর সংঘাতে জড়িত; মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রৌঢ়া ও প্রগল্‌ভা দুই রাজ্ঞী ধারিণী ও ইরাবতী এবং বিক্রমে ঔশীনরী উপস্থিত; শকুন্তলায় হংসপদিকা ও বসুমতীর উল্লেখ এবং তাদের আত্মনির্বেদ ও প্রেমের লাঞ্ছনার কথা উচ্চারিত; প্রণয়ী নায়কের প্রধান সহায় তাঁর বয়স্য বিদূষক; নায়িকার সঙ্গে তার সঙ্গিনী বা সখীরা আছে; মালবিকা পরিব্রাজিকার সঙ্গে, উর্বশী চিত্রলেখার সঙ্গে এবং শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সঙ্গে উপস্থিত; পুত্রজন্ম অথবা পুত্রের উপস্থিতি বা বীরত্বের মাধ্যমে মূল কাহিনীর সংঘাত অতিক্রম ও মঙ্গলময় মিলনের পরিণতি প্রদর্শিত; মালবিকাতে রাজপুত্রের যুদ্ধবিজয়ের সংবাদ, বিক্রমে আয়ুর উপস্থিতি এবং শকুন্তলায় ভরতের সঙ্গে দুষ্যন্তের পরিচয়ের মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি প্রদর্শিত। নায়িকাদ্বয় উর্বশী ও শকুন্তলা উভয়েই অভিশপ্তা, মালবিকা অভিশপ্তা না হলেও এক বছর আত্মগোপন করে রাজান্তঃপুরে অবস্থিতা। তবে শকুন্তলায় অভিশাপরূপ অলৌকিক ঘটনার দ্বারা নায়িকার আত্মশুদ্ধি ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নায়কের আত্মোন্নতি সাহিত্যগত আদর্শের বিচারে অতীব মূল্যবান ও ইঙ্গিতবহ; কিন্তু বিক্রমোর্বশীয়ে অভিশাপ থাকলেও তদ্রূপ আদর্শের সমন্বয় ঘটেনি। মঞ্চপ্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের এরূপ সমন্বয় অন্য কোনও নাটকে দেখা যায় না। প্রাকৃত গানগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও নাট্যপ্রয়োগের এরূপ পরিকল্পনা এক অভিনব সংযোজন। পরবর্তী কালের অনেক নাট্যকার এই অঙ্কের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যসমালোচক ও সাহিত্যরসিকদের বিচারে শকুন্তলা কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, প্রণয় ও সামাজিক আদর্শবোধের সংঘাত, রচনাশৈলীর উৎকর্ষ প্রভৃতি বিচারে এই নাটক নাট্যকারের শিল্পকুশলতার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের সম্পর্ক চিত্রণ এবং নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও নাট্যরসের আবেদন বিচারে এই নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

কুমারসম্ভব[৮৮] ঃ কুমার অর্থাৎ কার্তিকেয়ের সম্ভব অর্থাৎ জন্ম। দক্ষকন্যা সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন এবং গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা পার্বতীরূপে পুনরায় জন্ম নিলেন। ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনে পদার্পণ করলেন। দেবদূত নারদ পার্বতীর পতিরূপে শিবের নাম উত্থাপন করলেন। অন্যদিকে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব হিমালয়ের গুহায় নিভৃতে তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন। পার্বতী পিতার নির্দেশে দুই সখীকে সঙ্গে নিয়ে মহেশের পরিচর্যায় মন দিলেন। এই সময় তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে নিজেদের অসহনীয় অবস্থার কথা জানালেন। ব্রহ্মা তাঁদের জানালেন যে মহাদেবের ঔরসে জাত সন্তানই তারককে নিধন করতে সমর্থ। তিনি আরও বললেন

Scanned by CamScanner

যে তপস্যারত মহেশকে পূজারত পার্বতীর রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। ইন্দ্র বুঝলেন পার্বতী পরমেশ্বরের সন্তান দেবসেনাপতি হয়ে অসুরকে নিধন করবেন। তাঁর আদেশে কামদেব ঋতুরাজ বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করতে উপস্থিত হলেন। লাবণ্যময়ী পার্বতী মহেশের সম্মুখে পূজা দিতে গেলেন, অনঙ্গের প্রভাবে ধ্যানমগ্ন মহেশের অন্তর কামরাগে চঞ্চল হল। কিন্তু মদনের ছলনা ব্যর্থ হল; রুষ্ট মহেশের নয়নবহ্নিতে কামদেব দগ্ধ হলেন। কামদেবের অপমৃত্যুতে তাঁর পত্নী রতি শোকে হাহাকার করে উঠলেন। তারপর রতি যখন স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তখন সহসা দৈববাণী হল—শিব-পার্বতীর বিবাহ হলে শিবের বরে কামদেব পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবেন। আশ্বস্তা রতি আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। অন্যদিকে পার্বতী অভীষ্ট দেবতাকে আপন রূপে প্রীত করতে অসমর্থ হয়ে তাঁর তুষ্টিকামনায় কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। অবশেষে পার্বতীর তপশ্চর্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব তরুণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তার নিষ্ঠা পরীক্ষা করতে এসে স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন এবং অপর্ণাকে স্ত্রী রূপে কামনা করলেন। অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি সাত ঋষি এসে শিব-পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হিমালয় সানন্দে তাঁদের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। হিমালয়ের রাজধানীতে আর কৈলাশে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে মহাদেব বাঘছাল পরে ষাঁড়বাহনে চড়ে কৈলাস থেকে যাত্রা করলেন; তাঁর পিছনে অষ্ট মাতৃকা, তারপর কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী, তারপর প্রমথগণ। সপ্তর্ষিরা হলেন পুরোহিত, গন্ধর্বেরা গায়েন। যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হল। অতঃপর বরবধূ কৈলাসে ফিরলেন। কৈলাসের কাননে গিরিকন্দরে শিব-পার্বতীর নবমিলনের প্রথম দিনগুলি পরম সুখে কাটতে লাগল। একদিন নবদম্পতি গিরিগুহায় রতিসুখে মগ্ন, এমন সময় হঠাৎ অগ্নির উপস্থিতিতে সচকিত মহেশের তেজঃ সহসা স্খলিত হল। পার্বতী তা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে সেই শিবশক্তি আগুনে নিক্ষেপ করলেন; অগ্নি দেবতা তা সহ্য করতে না পেরে জলে নিক্ষেপ করলেন; কৃত্তিকারা সেই জল পান করে গর্ভ ধারণ করল এবং ছ'জন কৃত্তিকা শরবণে এক শিশুর জন্ম দিল। তাই সেই সন্তানের নাম হল কার্ত্তিকেয় (কৃত্তিকাদের সন্তান, অথবা স্কন্দ—স্খলিত শিবতেজ, অথবা শর-জন্মা)। অতঃপর কুমার কার্তিকেয় দেবসেনাপতিরূপে যুদ্ধে তারকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করেন।

কুমারসম্ভব কাহিনীর উৎস কি? রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্য, ব্রহ্ম, সৌর, কালিকা ও শিব পুরাণে শিব-পার্বতীর মূল কাহিনীটি পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে আলোচ্য কাহিনী বিশদ আকারে বর্ণিত এবং অন্যত্র (অনুশাসন ও শল্য পর্বে) এর উল্লেখ আছে। শিবপুরাণ ও কুমারসম্ভবের কাহিনীতে গভীর সাদৃশ্য আছে এবং বহু শ্লোক হুবহু এক। পণ্ডিতদের অনুমান এক্ষেত্রে পুরাণকর কালিদাসের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে ঋণী। তবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী ও কালিদাসের কাহিনীর মধ্যে গরমিল আছে। অধিকাংশ পুরাণ ও উপপুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে; সুতরাং কালিদাস পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত কি না তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন সাহিত্য থেকে মূল কাহিনীটি গৃহীত হলেও সমগ্র ঘটনার বিস্তার ও বিশ্লেষণে কালিদাসের

Scanned by CamScanner

মৌলিকতা ও বৈদগ্ধ অনস্বীকার্য। হিমালয়ের বর্ণনা, পার্বতীর যৌবন বর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, রতিবিলাপ, পার্বতীর তপস্যা, শিব-পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা প্রভৃতি সর্বত্রই কবির মৌলিকতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

কুমারসম্ভবের প্রায় অর্ধশত টীকাকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নরহরি, ভরতসেন, ভরতমল্লিক, মল্লিনাথ, বল্লভদেব, গোবিন্দরাম, জিনভদ্রসূরি, দক্ষিণাবর্তনাথ বিদ্যামাধব, অরুণগিরিনাথ, সরস্বতী তীর্থ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, জীবানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গবিশিষ্ট মহাকাব্যরূপে পরিচিত হলেও অষ্টম বা নবম থেকে শেষ অবধি রচনা সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কোনও মতে মূল রচনা বাইশ সর্গে সমাপ্ত এবং সমগ্র রচনাই কালিদাসের নিজস্ব। মল্লিনাথ ও অরুণগিরি অষ্টম পর্যন্ত টীকা লিখেছেন। কোনও মতে সপ্তম পর্যন্তই কালিদাসের রচনা, তাই বঙ্গদেশীয় সংস্করণগুলির সপ্তম সর্গেই সমাপ্ত[১৯]। অষ্টম সর্গে শিব-পার্বতীর বিহারবর্ণনায় সম্ভোগ-শৃঙ্গারের সাড়ম্বর চিত্রগুলি কামশাস্ত্রের প্রথানুগ বর্ণনামাত্র। কালিদাসের কাব্যে অন্যত্র এরূপ বর্ণনার সুযোগ থাকলেও তা সযত্নে পরিহৃত এবং অনেকের মতে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দৃষ্টিতেই দেবদেবীর কামকলাবিলাসের এমন নগ্ন চিত্র অশ্লীলতার পর্যায়ে উপন্যস্ত। একদল সমালোচক রচনাশৈলীর বিচারে অষ্টম সর্গের পরবর্তী অংশকে কালিদাসের রচনারূপে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক; অবশ্য এর বিরোধীরা সমগ্র কাব্যকেই কালিদাসের মৌলিক রচনারূপে যুক্তি দেখান।

রঘুবংশ[২০] ঃ ১৯ সর্গের মহাকাব্য রঘুবংশ কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। মহাকাব্যোচিত বিচিত্র সম্ভার ও রচনাগৌরবে এই কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সার্থক কবিকৃতিরূপেও পরিচিত। রঘুর বংশ অর্থাৎ রঘুবংশের খ্যাত-অখ্যাত নৃপতি বর্গের চরিত বর্ণনাই আলোচ্য কাব্যের বিষয়বস্তু। কবি দিলীপ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ইক্ষ্বাকু বংশের ২৮ জন রাজার জীবনী, কার্যকলাপ, বীর্যগাথা এবং তৎসহ প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ও উপস্থাপিত করেছেন। ১ম-১০ম সর্গ পর্যন্ত প্রখ্যাত নৃপতি-পঞ্চকের (দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র) কাহিনী, ১০ম-১৫শ সর্গ পর্যন্ত রামচরিত এবং শেষ ৪ সর্গে অবশিষ্ট ২৩ জন রাজার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণিত।

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ ১ম সর্গ—অর্ধনারীশ্বর পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করে 'মন্দঃকবিযশঃপ্রার্থী' কবি রঘুবংশের মহৎ ঐতিহ্য বর্ণনায় পূর্বসূরিদের পন্থা অনুসরণের উল্লেখ করেছেন। তারপর সূর্যবংশের আদি পুরুষ মনু, তাঁর উত্তরসূরি দিলীপ ও তৎপত্নী সুদক্ষিণার উল্লেখ, নিঃসন্তান দম্পতির কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রা; ২য়—রাজদম্পতি কর্তৃক বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর পরিচর্যা, নন্দিনী কর্তৃক বরদান; ৩য়—দিলীপ ও সুদক্ষিণার পুত্র রঘুর জন্ম থেকে বিবাহ, দিলীপ কর্তৃক অশ্বমেধ অনুষ্ঠান, যজ্ঞশেষে রঘুর হাতে রাজ্যভার অর্পণ ও রাজদম্পতির বানপ্রস্থ অবলম্বন; ৪র্থ—পূর্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রা, বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন;

Scanned by CamScanner

৫ম-৮ম—রঘুর পুত্র অজের জন্ম থেকে বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, দশরথের জন্ম, ইন্দুমতীর আকস্মিক মৃত্যু, শোকাহত অজের প্রাণত্যাগ; ৯ম-১০ম—দেবগণ কর্তৃক নারায়ণের স্তুতি, অত্যাচারী রাবণকে নিধনের জন্য নারায়ণের রামরূপে আবির্ভাবের বার্তা, দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং চার পুত্র লাভ; ১১শ-১৫শ—রামের কৈশোর জীবন, বিবাহ, বনবাস, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাম-লক্ষ্মণ সীতার অযোধ্যায় প্রত্যবর্তন, সীতা-পরিত্যাগ, লব-কুশের জন্ম, সপুত্র সীতার সঙ্গে রামের পুনর্মিলন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি; ১৬শ-১৯শ—কুশ, অতিথি, নিষধ, নল, নাভ, পুণ্ডরীক, ঘোষ, শঙ্ঘন, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, ব্রাহ্মথ, পুত্র, পুণ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন ও অগ্নিবর্ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রামকাহিনীতে বাল্মীকি বর্ণিত রামকথার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সবই পাওয়া গেল। শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ বিলাসী ও কামপরতন্ত্র, অত্যধিক কামভোগে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই অন্তঃসত্ত্বা রাজ্ঞী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহাকাব্যের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

রঘুবংশের ৪০টির অধিক টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মল্লিনাথের সঞ্জীবনী টীকা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ[৮১]। অন্যান্য টীকাকারগণের মধ্যে হেমাদ্রি, দক্ষিণাবর্তনাথ, ভরতসেন, অরুণগিরিনাথ, গুণবিনয়গণি, নারায়ণ, ভরতমল্লিক, ভবদেব মিশ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

মহাকাব্যের উৎস—রামকাহিনী রামায়ণ ব্যতীত মহাভারত, কথাসরিৎ সাগর ও কতিপয় পুরাণে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। কাব্যের সূচনায় কবি তাঁর পূর্বসূরিদের সপ্রশংস উল্লেখ করলেও অন্যত্র একমাত্র বাল্মীকি কর্তৃক রামচরিত বর্ণনার উল্লেখ করেছেন[৮২]। রঘুবংশ নামটিও তিনি সম্ভবতঃ রামায়ণ থেকেই গ্রহণ করেছেন[৮৩]।

কালিদাস রামায়ণের মূল কাহিনী গ্রহণ করলেও সম্ভবতঃ রামকথার এক পৃথক পরম্পরা অনুসরণ করেছেন[৮৪]। রঘুবংশের ১ম সর্গ এবং মায়াসিংহ ও দিলীপের কথোপকথনের সঙ্গে পদ্মপুরাণের কাহিনীর (যথাক্রমে উত্তরখণ্ড ১৯৮-৯৯ অধ্যায়) বিশেষ মিল আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে পুরাণকার কালিদাসের বর্ণনার অনুকরণ করেছেন। দিলীপ-সুদক্ষিণার বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রা, মায়াসিংহের কাহিনী, রঘুর দিগ্বিজয়,[৮৫] ইন্দুমতীর স্বয়ংবর, অজবিলাপ, অজের প্রতি বশিষ্ঠের সন্দেশ, সীতা-পরিত্যাগ প্রভৃতি বহু কাহিনীর উদ্ভাবনায় অথবা উপস্থাপনায় মহৎ কবির নৈপুণ্য, শিল্পবোধ ও রসদৃষ্টির স্বাক্ষর পরিস্ফুট। আলোচ্য কাব্যটি সম্পর্কে কোনও কোনও প্রাচীন সমালোচক হয়ত বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন,[৮৬] কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত, টীকাকার ও রসজ্ঞ সমালোচক কালিদাসের এই গ্রন্থকে সাদরে বরণ করেছিলেন[৮৭]। ইতিহাসনিষ্ঠা, অতিপ্রাকৃত উপাদান, প্রকৃতিচিত্রণ, মানবীয় প্রেম, ত্যাগ-সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার মহিমা এবং বাস্তববোধ প্রভৃতি বহুবিধ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য মিলে রঘুবংশ এক আকর্ষণীয় সৃষ্টি। ভাবগর্ভ সংলাপ, পরিমার্জিত রচনারীতি, ছন্দঃ-অলঙ্কারের নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণে কালিদাসের কবিপ্রতিভার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এই মহাকাব্যের মাধ্যমেই

Scanned by CamScanner

পাওয়া যায়[৮]। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা রঘুবংশেই মহৎ চরিত্রের উপস্থিতি বেশি; তবে তিনি প্রধানতঃ রামচিত্রকেই আদর্শরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী অধিকাংশ রাজার নামোল্লেখ করেই তৃপ্ত। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ধারাকেই হুবহু অনুসরণ করেছেন।

কবি রঘুবংশে ইতিহাসের তুল্য মর্যাদাপূর্ণ কাহিনী কাব্যরসে অভিষিঞ্চিত করে পাঠকের দরবারে পরিবেশন করেছেন; তাই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন, ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিবোধ, রাজতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা, রাজকীয় প্রেমের উত্তুঙ্গ আদর্শ, নিসর্গ-প্রীতি প্রভৃতি বহু বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে রঘুবংশ সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শস্থানীয় রচনা। কুমারসম্ভবের ঘটনা দেবকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও প্রকৃত বিচারে মানবীয় প্রেমের বর্ণনামাত্র। অতিপ্রাকৃত উপাদান, দৈব মহিমা ও আদর্শের সঙ্গে তৎকালীন গার্হস্থ্য জীবনের বহু বিচিত্র উপাদান নিখুঁতভাবে পরিবেশিত। এই মহাকাব্যে আধুনিক উপন্যাস ও বড় গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ও পরবর্তী অলঙ্কার গ্রন্থসমূহে মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত, কালিদাসরচিত মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে সেই সংজ্ঞার সামঞ্জস্য নেই; অথচ আলঙ্কারিকগণ সকলেই এই দুই রচনাকে আদর্শ মহাকাব্যরূপে নির্বিচারে উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যায় কালিদাসের কালে মহাকাব্য রচনার পৃথক একটি ধারা প্রচলিত ছিল।

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার কাহিনী বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনায় মানবীয় প্রেমতত্ত্বের মহৎ আদর্শবোধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ প্রেমবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলবোধের সমন্বয় প্রতিপাদন করেছেন[৯]। তবে কালিদাসের অপর দুটি নাটকে নায়ক-নায়িকার চপল ও স্বার্থমগ্ন প্রণয়ের ক্ষেত্রে অভিশাপ বা তপস্যার দ্বারা আত্মশুদ্ধির সমর্থন পাওয়া যায় না। সৌহার্দ্য, বাৎসল্য ও তারুণ্য প্রেম, কর্তব্যবোধ ও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন এবং সর্বোপরি ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলচেতনাকে একসূত্রে বন্ধনের দ্বারা শকুন্তলা প্রাচীন সাহিত্যের এক মহনীয় সৃষ্টি। এই নাটক কবির পরিণত প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ ফসল। কালিদাস প্রাচীন সাহিত্যের সর্ববিধ শাখায় নিষ্ণাত, প্রাচীন ঐতিহ্যে কুশলী ও শ্রদ্ধাশীল, ছন্দঃ ও অলঙ্কারে নিপুণ; ভারতের ভূচিত্র উন্মোচনে, নিসর্গ প্রকৃতির রমণীয় বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে, মানবমনের বিশ্লেষণে, অতিপ্রাকৃত ও লৌকিক উপাদানের আঙ্গিক ব্যবহারে সার্থক কবি ও নাট্যকার।

আধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভারততত্ত্ববিদ সমালোচকগণের অনেকেই কালিদাসের সাহিত্যের পক্ষে ও বিপক্ষে নানান সমালোচনা করেছেন; কোনও কোনও সমালোচনায় অত্যধিক উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়, কোনও কোনও সমালোচনায় তুলনামূলক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনার ত্রুটি ও দুর্বলতা উত্থাপিত। প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক Goethe শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন[১০]। অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সাহিত্যে মহৎ কাব্যের দীপ্তি ও দ্রুতি, মানবতাবোধ এবং সর্বোপরি সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ সামঞ্জস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের কোনও সমালোচক কালিদাসকে 'Indian Shakespeare' বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, আবার কেউ তাঁর কাব্যে চিরায়ত মানবিক

Scanned by CamScanner

দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষ্য করেছেন,[১১] কেউ বা তাঁকে Dante ও Shakespeare-এর তুল্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। তবে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে নিছক ভাববাদী অথবা চরম বস্তুবাদী বিচার কোনটিই সাহিত্যসমালোচনার একমাত্র আদর্শ নয়; বর্তমান কালের কোনও আদর্শকে সম্মুখে রেখে প্রাচীন সাহিত্যের বা শিল্পকলার মূল্যায়ন করলে তা একদেশদর্শী হয়ে উঠতে পারে। কালিদাস ষড়্‌দর্শনের ধারায় প্রতিপালিত, ভারতীয় জীবনদর্শনের আদর্শে পরিপুষ্ট এবং রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের পটভূমিকায় বিবর্ধিত; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় প্রতিফলিত, ভারতীয় জীবনসাধনার ভোগ ও ত্যাগের সমন্বিত আদর্শ তাঁর প্রজ্ঞায় ও মননে অনুস্যূত।

কালিদাসের রচনাসমূহে তাঁর দার্শনিক মনন ও চিন্তনের যে সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়েছে, তাকে ভারতীয় দর্শনের কোনও এক বিশিষ্ট মতবাদের ধারায় এককভাবে বিচার করা যায় না। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে এক আনুমানিক পৌর্বপর্য স্বীকার করে নিয়ে কেউ কেউ কবির মনোজগতে ধর্মদর্শনের বিকাশের ধারায় একটা বিবর্তনকে স্বীকার করেছেন। কারও কারও মতে ষড়্‌দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও কালিদাস ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচিন্তায় ছিলেন শৈব এবং শৈব দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত একটি সামগ্রিক দর্শনচেতনা কবিসত্তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর তিনটি নাটকের প্রস্তাবনায় মহাদেবের স্তুতি করা হয়েছে[১২]; শকুন্তলার ভরতবাক্যে নাট্যকার নীললোহিত মহেশের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন; রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেও আদি জনক-জননী শিব-পার্বতীর বন্দনা করেছেন। আবার ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মেলনে যে পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিকাশ, তারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে কালিদাসের কাব্যে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্মদর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে কালিদাস সম্পূর্ণ উদাসীন।

পাদটীকা

১. ঋ. বে. ৪|৩|১৬; অ. বে. ৮|২|২|১০

২. উষস্-সূক্তের মন্ত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

৩. ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত পুরূরবা-উর্বশী, নরসিংহ পুরাণে যম-যমী প্রভৃতি কাহিনী দ্রষ্টব্য।

৪. ঋ. বে. ১০|৯৫; ৪|৪২; ১০|৮৬; ১০|১০৮ দ্রষ্টব্য

৫. ঋ. বে. ১|৯২|৪; ১|১২৪|৭; ১|১৬৪|২০; ১০|৭১|২ দ্রষ্টব্য

৬. উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে। ঋ. বে. ৮|৩|১৫
মধুচ্ছন্দো ভণতি রেভ ইষ্টৌ। ঋ. বে. ৬|১১|৩
নিবচনা কবয়ে কাব্যান্যশংসিষং মতিভির্বিপ্র উক্থৈঃ। ঋ. বে. ৪|৩|১৬
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুত্তরোত্তরাৎ কবিঃ কাব্যেন পরিপাহ্যগ্নে। অ. বে. ৮|২|৩|১৯

৭. তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত। ঋ. বে. ৮|৬|৪৩

৮. নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং / নাসীদ্রজো ন ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্ / অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥

Scanned by CamScanner

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের কিছু তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয় সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে

দিলরুবা খন্দকার

সংস্কৃত বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়।

Scanned by CamScanner